বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ - একটি সার্বজনীন জনযুদ্ধের অনন্য দলিল

নৌপ্রকৌ. ড. সাজিদ হোসেন (কিশোর মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর-৭)

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, যেখানে একটি জাতি অস্তিত্ব, স্বভাষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়েছিল। একটি সামরিক সংঘাত নয়, বরং একটি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে গঠিত এক মহাকাব্যিক জনযুদ্ধ। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি স্বতস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশ ছিল কৃষক, শ্রমিক, নারী, ছাত্র, শিক্ষক, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রবাসী এবং পেশাজীবী শ্রেণির। এ যুদ্ধ একাধারে ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং মানবিক মুক্তির আন্দোলন, এবং অন্যদিকে ছিল এক সার্বজনীন জনগণের যুদ্ধ (People's War)। ১৯৭১ সনের সূচনায়, ঘটনা পরম্বপরায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য নেতৃত্বে, দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্পন্দন মিলেছিল স্বাধীনতার ঐকতানে। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গতাজ তাজুদ্দিন আহমেদ এবং প্রধান সেনাপতি কর্ণেল আতাউল গণি ওসমানীর অসামান্য ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ একতায় হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালি জাতি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: অন্যায়ের বিরুদ্ধে চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পূর্ববাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) কে ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে উপেক্ষিত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যুত্তর আসে ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। একদিকে রাষ্ট্রীয় দমননীতি, অন্যদিকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া উর্দুর আধিপত্য বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবি ও গণজাগরণ সৃষ্টি করে। এ সময়ে বাঙালির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে যা স্পষ্টতই বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিলাষের দিকে ধাবিত করে। আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হয় ১৯৬৮ সালে। বাঙালির তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারিতে মুক্ত শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়; উপাধিটির ঘোষণা দিয়েছিলেন তরুণ নেতা তোফায়েল আহমেদ। সেই থেকে মানুষের ভালবাসায় শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠলেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'!

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের অনাগ্রহ প্রমাণ করে দেয়—বাংলার প্রতি অবিচার অব্যাহত থাকবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে জাতি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" এ ভাষণ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

২৫ মার্চ: গণহত্যার সূচনা ও প্রতিরোধের অগ্নিগর্ভ রূপ

২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের বর্বর অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকার রাস্তায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, এবং সাধারণ জনগণের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হয়। লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়। ঠিক সেসময়ে, মধ্যরাতের ঠিক পরপরই, বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন!' সেই ঘোষণা ট্রান্সমিটার/টেলিগ্রামে পৌঁছে যায় চট্টগ্রামসহ দেশে-বিদেশে। এরপর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। এই গণহত্যা জাতিকে আন্দোলন থেকে অস্ত্রের সংগ্রামে রূপান্তরিত করে।

২৬ মার্চ, দেশজুড়ে অসংখ্য প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রতিধ্বনি প্রচার করেন সর্বজনাব এম এ হান্নান, আবুল কাশেম সন্দীপ ও আবদুল্লাহ আল ফারুক। পরদিন, ২৭শে মার্চে মেজর জিয়াউর রহমানও ওই বেতার থেকে প্রচার করেন, "আমি মেজর জিয়া বলছি... আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। জয় বাংলা।" এভাবেই আমাদের স্বাধীনতার বার্তা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, দেশে দেশে। সাধারণ মানুষ নিজের সাধ্য অনুযায়ী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কারও হাতে অস্ত্র ছিল, কারও হাতে ছিল প্রতিবাদ, খাদ্য, সেবা বা তথ্য।

কৃষক-শ্রমিক ও গ্রামীণ সমাজ: প্রতিরোধের মৌল ভিত্তি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে এবং এই জনগোষ্ঠী ছিল মুক্তিযুদ্ধে প্রাণপ্রবাহের মতো। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেন, রাতের অন্ধকারে পথপ্রদর্শক হন, খাদ্য জোগান, এমনকি চাষাবাদের ফাঁকে ফাঁকে গেরিলা কার্যক্রমে অংশ নেন। যখন মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ট্রেনিং নিতে যেতেন, তখন গ্রামের মানুষ তাঁদের নিরাপদে পৌঁছাতে সাহায্য করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই গেরিলা আক্রমণের পূর্বে গোয়েন্দা তথ্য বা দিকনির্দেশনা আসত স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকেই। বহু মুক্তিযোদ্ধার পেছনে একজন দরিদ্র কৃষক কিংবা শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন যারা নীরবে তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীর বহু গ্রাম গেরিলা ঘাঁটিতে রূপ নেয়। তাঁরা আত্মরক্ষায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন বল্লম, দা, কুড়াল—যার যা ছিল, তাই নিয়েই যুদ্ধে নামেন।

নারীর অবদান: সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রতিচ্ছবি

বাংলাদেশের নারীরা এই যুদ্ধে শুধু সহিংসতার শিকারই হননি, বরং সাহসী যোদ্ধা হিসেবে সামনে এসেছেন। সরকারি হিসাবে প্রায় ৫০০ নারীকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও প্রকৃত সংখ্যা ছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। তাঁদের কেউ মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করেছেন—যেমন কল্পনা দত্ত, হালিমা খাতুন, তহমিনা বেগম, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন—যেমন সুফিয়া কামাল, সৈয়দা রাশেদা বারী, নাসরীন পারভীন হক। অনেক নারী চিকিৎসক ও নার্স হিসেবে ক্যাম্পে কাজ করেছেন, গোপনে অস্ত্র পরিবহন করেছেন, বার্তা বহন করেছেন। তাঁরা শুধুমাত্র পুরুষদের সহায়ক ভূমিকায় ছিলেন না, বরং নিজেরাই 'ফ্রন্টলাইনে' ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার হয়েও অনেক নারী যুদ্ধের পর মাথা উঁচু করে সমাজে ফিরে আসেন—এটি ছিল এক সামাজিক বিজয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিশোর-কিশোরীদের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের অবদান এক অনন্য ও গর্বের বিষয়। ১৯৭১ সালের সেই কঠিন সময়ে অনেক কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছিল, আবার কেউ কেউ গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি, সংবাদ আদান-প্রদান, খাবার সরবরাহ, আশ্রয় প্রদান এবং

গোপন তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অনেকের মাঝে কনিষ্ঠতম ১০ বছরের লালুর কথা চিরস্বরণীয়!

অনেক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা তাদের বয়স গোপন করে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। কেউ কেউ পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি নজরে রেখে মুক্তিবাহিনীকে খবর দিয়ে সহায়তা করেছেন। কোনো কিশোর রেললাইন কেটে, ব্রিজ ধ্বংস করে, অথবা মাইন পুঁতে শত্রুর চলাচল ব্যাহত করেছে। নারী কিশোরীরাও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে — মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা, রান্নাবান্না, কিংবা বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পল্লী এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলা তাদের অংশগ্রহণকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন, কেউ কেউ নিখোঁজ। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায় হয়ে আছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা আজও নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত করে।এইভাবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের অবদান ছিল সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও আত্মত্যাগে ভরপুর—যা স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত।

ছাত্র-যুবকদের জাগরণ ও সংঘবদ্ধতা

১৯৭১ সালে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ৬৯-এর গণআন্দোলন থেকে পাওয়া রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাঁদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা শিবির গড়ে তুলেছিলেন মুক্তিবাহিনী সংগঠনের জন্য। সেক্টর কমান্ডারদের নেতৃত্বে তাঁরা ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সীমান্ত এলাকায় গেরিলা হামলা চালাতেন। তারা ট্রেন লাইন কেটে, ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে কিংবা সেনা চলাচলের তথ্য দিয়ে যুদ্ধকে বেগবান করেন। এই ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তার অবদান

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, এবং উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল, হাজং, ও রাজবংশীদের একটি বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেন। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় তাঁদের বসতবাড়ি ছিল গেরিলা ক্যাম্প বা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে পাকিস্তানি বাহিনীর লক্ষ্যবস্তু হন। তবুও তাঁরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রাম ও খুলনায় অনেক হিন্দু যুবক মিত্রবাহিনীর সহায়তায় ফোর্স গঠন করেন। ত্রিপুরা ও মেঘালয় সীমান্তে আদিবাসীদের ভূমিকা মুক্তিবাহিনীর চলাচলে সহায়ক হয়।

প্রবাসী বাঙালির সক্রিয় কণ্ঠ

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বহির্বিশ্বে জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। লন্ডনের 'বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি' এবং নিউ ইয়র্কের 'American Association of Bangladeshis' তহবিল সংগ্রহ, বিক্ষোভ, এবং রাজনৈতিক লবিং করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে। ভারত ও অন্যান্য দেশে অবস্থিত শরণার্থী ক্যাম্পে তাঁরা অর্থ ও মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেন।

পেশাজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিরোধ

চিকিৎসকরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধাহতদের সেবা দিয়েছেন সীমান্ত ক্যাম্প ও গোপন ক্লিনিকে। যেমন, ডা. আলিম চৌধুরী, যিনি যুদ্ধশেষে শহীদ হন। প্রকৌশলীরা ব্রিজ, রেডিও ট্রান্সমিশন, অস্ত্র মেরামতে সহায়তা করেন। শিক্ষকরাও প্রচার ও সংগঠনের কাজে অংশ নেন। সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা ছিল অনন্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাউল গান, গণসংগীত, নাটক প্রচার করে

মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তোলে। শিল্পী-সাংবাদিকরা মুজিবনগর সরকারের তথ্য প্রচারে বড় ভূমিকা রাখেন।

আন্তর্জাতিক সহায়তা ও ভারতের অবদান

ভারতের সরকার, জনগণ ও সেনাবাহিনী বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায় ঐতিহাসিকভাবে। প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে তারা শুধু মানবিক দৃষ্টান্তই স্থাপন করেনি, বরং রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলোতে ১০০০-রও বেশি শরণার্থী শিবির গড়ে তোলা হয়, যেখানে খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ভারতের RAW এবং সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীকে সমন্বয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহে সহায়তা করে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমান হামলার পর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং মাত্র ১৩ দিনের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধুর অবদান ও দিকনির্দেশনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু, যার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ব ছাড়া এই সংগ্রাম জাতিগত ঐক্যে রূপ নিতে পারত না। তাঁর ভাষণ, রাজনৈতিক দাবি, এবং গণমানুষের সঙ্গে একাত্মতা জাতিকে এক মোহনায় এনে দাঁড় করায়। পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে বন্দি হয়েও তাঁর উপস্থিতি ছিল সকলের চেতনায়। প্রতিদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে "বজ্রকণ্ঠ" নামের অনুষ্ঠানে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর ভাষনের অংশবিশেষ ছিল সকল বাঙালির অনুপ্রেরণা। মুজিবনগর সরকার তাঁর নামেই শপথ নেয়, রণাঙ্গনে তাঁর নামেই সৈনিকরা প্রেরণা পায়।

উপসংহার: ইতিহাসের এক মহাকাব্যিক গণজাগরণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো দলীয় প্রপাগান্ডা নয়, এটি ছিল মানুষের যুদ্ধ—একটি ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম। একে 'গণযুদ্ধ' বলার কারণই হলো এই—যেখানে কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, সংখ্যালঘু-আদিবাসী, শিল্পী-প্রবাসী—সবাই একটি জাতির জন্মের অংশীদার। এই সর্বজনীন চরিত্রকেই সামনে রেখে ইতিহাস রচনার প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধের এই গণতান্ত্রিক, সর্বজনীন চেহারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আত্মপরিচয়, দেশপ্রেম ও ঐক্যের পথে পরিচালিত করবে।

তথ্যসূত্র

1. Government of Bangladesh. (2013). *Bangladesh Genocide Archive*.
2. Hasan, M. (2008). *The Role of Women in the Liberation War*. Dhaka: Bangla Academy.
3. Ahamed, E. (2014). *History of Bangladesh 1971–1981*.
4. Bose, S. (2011). *Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War*.
5. The Daily Star Liberation War Archive (2021).
6. Jahan, R. (1972). *Pakistan: Failure in National Integration*. Columbia University Press.
7. Interview with Sector Commanders Forum (2021).
8. Bangladesh Itihash Parishad (2020). *Muktijuddher Shomogrik Itihash*.

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

- Ahmed, Kamal Uddin. *Muktijuddho Bishoyok Bishwakosh*. Muktijuddho Academy, 2015.
- Chakrabarty, Bidyut. *The Partition of Bengal and Assam, 1932–1947: Contour of Freedom*. Routledge, 2004.
- Islam, Sirajul & Jamal, Ahmed A. (Eds.). *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*. Asiatic Society of Bangladesh, 2003.
- Mascarenhas, Anthony. *The Rape of Bangladesh*. Vikas Publications, 1971.
- Maniruzzaman, Talukder. *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*. University Press Limited, 1988.